লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি

ফিরাস আল খতিব

ভাষান্তর
শাহেদ হাসান

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : শাহেদ হাসান
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৫

খিলাফাহ বুকশপ
গুলজার টাওয়ারের ২য় তলায়, ব্লক-সি, দোকান নং ১১, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ : ০১৭৬০০৬২০০৮, ০১৮৭৫০০৪৪৫৬

অনলাইন পরিবেশক
খিলাফাহ বুকশপ
https://khilafahshop.com

Lost Islamic History
by **Firas Alkhateeb**

Published by
Guideline Publication
Shop No. 8, Ground Floor, Madrasa Market, 34 Banglabazar, Dhaka.
মূল্য : ৳৬০০, $20, £17

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the prior written permission of the publisher. Brief quotations for review or scholarly use are permitted, provided proper acknowledgment is given.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অনুবাদকের কথা

মানুষের স্মৃতিশক্তিই তার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যে মানুষ তার অতীত ভুলে যায়, সে মূলত তার সত্তাকেই হারিয়ে ফেলে। সে জানে না সে কে, কোথা থেকে এসেছে, কিংবা তার গন্তব্যই বা কোথায়। ব্যক্তিমানুষের মতো একটি জাতির জন্যও এ কথা সমানভাবে সত্য। ইতিহাস হলো একটি জাতির সামষ্টিক স্মৃতি। যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে যায়, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে জাতি পরিণত হয় এক মৃতপ্রায় জনপোষ্ঠীতে; ঝড়ের ঝাপটায় যে কোনো মুহূর্তে উপড়ে পড়াই যার নিয়তি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অবস্থা সেই স্মৃতিভ্রম হওয়া পথিকটির মতো। আমরা এক গৌরবোজ্জ্বল অতীতের উত্তরাধিকারী, অথচ সেই উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমরা আজ চরমভাবে উদাসীন। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে রোমান সাম্রাজ্যের বীরত্বগাথা আছে, ফরাসি বিপ্লবের খুঁটিনাটি আছে, কিন্তু নেই আমাদের পূর্বসূরিদের সেই অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগের উপাখ্যান—যারা একদা আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ইনসাফ ও জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়েছিলেন। এই বিস্মৃতি আমাদের হীনম্মন্যতার অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে, আমরা বুঝি সর্বদা এমনই পরাজিত ও পশ্চাৎপদ ছিলাম। অথচ, ইতিহাসের আয়নায় তাকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র দেখা যায়।

ফিরাস আল-খতিবের 'লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি' বা 'হারানো ইসলামের ইতিহাস' বইটি ঠিক এই বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে ফেলার এক অসাধারণ প্রয়াস। ১৪০০ বছরের সুবিশাল ক্যানভাসকে তিনি যেভাবে এক মলাটে এবং সুখপাঠ্য আখ্যানে রূপ দিয়েছেন, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

কেন এই বই? বাজারে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থের কোনো অভাব নেই। ইবনু জারির আত-তাবারির বিশাল খণ্ডগুলো থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের একাডেমিক গবেষণাপত্র—এই ভাণ্ডারটি সুবিশাল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের জন্য, বিশেষ করে আজকের তরুণ প্রজন্মের জন্য এমন একটি বইয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল, যা তাদেরকে খুব সহজে, সাবলীল ভাষায় এবং অল্প সময়ে তাদের শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। ফিরাস আল-খতিব সেই শূন্যস্থানটিই পূরণ করেছেন।

এই বইটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর 'গ্লোবাল' বা বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণত ইসলামের ইতিহাসের বইগুলো আরবকেন্দ্রিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের পরে ইতিহাস যেন থমকে যায়। কিন্তু লেখক আমাদের দেখিয়েছেন, ইসলামের ইতিহাস কেবল আরবের মরুভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি আমাদের হাত ধরে নিয়ে গেছেন পশ্চিম আফ্রিকার স্বর্ণখচিত মালির সাম্রাজ্যে, যেখানে মানসা মুসা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। তিনি আমাদের ঘুরিয়ে এনেছেন চীনের জিয়ান শহরের মুসলিম মহল্লায়, আন্দালুসের কর্ডোভার লাইব্রেরিতে, কিংবা ভারত মহাসাগরের বুক চিরে চলা মালয় দ্বীপপুঞ্জের বণিকদের জাহাজে। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা ভূখণ্ডের গণ্ডি পেরিয়ে সত্যিকারের একটি বিশ্বজনীন সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় এই বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে এক গভীর দায়বদ্ধতা কাজ করেছে। আমাদের বাংলাভাষী মুসলিম তরুণদের মধ্যে ইদানীং নিজের ইতিহাস জানার এক প্রবল তৃষ্ণা লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা জানতে চায়—কীভাবে একদল উটপালক বেদুইন মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তিকে পরাজিত করেছিল? তারা জানতে চায়—ক্রুসেড ও মোঙ্গল হামলার মতো মহাবিপর্যয়ের পরও কীভাবে এই উম্মাহ ফিনিক্স পাখির মতো ভস্মস্তূপ থেকে জেগে উঠেছিল? তারা জানতে চায়—আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতায় তাদের পূর্বসূরিদের অবদান কতটুকু?

এই বই অনুবাদ করতে গিয়ে বারবার শিহরিত হয়েছি। কখনো আবেগে চোখ ভিজেছে, কখনো হৃত গৌরবের বেদনায় বুক ভারি হয়েছে, আবার কখনো অদম্য আশায় মন নেচে উঠেছে। বাগদাদ ধ্বংসের বর্ণনা অনুবাদ

করার সময় মনে হয়েছে, যেন নিজের চোখের সামনেই পুড়ছে বাইতুল হিকমাহ। আবার আইন জালুতের প্রান্তরে মামলুকদের বিজয়ের দৃশ্য যখন শব্দে বুনছিলাম, তখন এক স্বর্গীয় প্রশান্তি অনুভব করেছি। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইতিহাসের এই চড়াই-উতরাইগুলোকে কেবল সাল-তারিখের ফ্রেমে বন্দি না করে, তার পেছনের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

অনুবাদক হিসেবে আমার সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল মূল লেখকের বক্তব্যের নির্যাসটুকু অক্ষুণ্ন রাখা। ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠন ও প্রকাশভঙ্গি থেকে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ভিন্ন। তাই শাব্দিক অনুবাদের চেয়ে ভাবানুবাদে জোর দিয়েছি বেশি। চেষ্টা করেছি ভাষাটি যেন প্রাঞ্জল ও গতিশীল হয়, যেন পাঠক ইতিহাসের কোনো নিরস পাঠ্যবই পড়ার ক্লান্তি অনুভব না করেন; বরং মনে করেন তিনি এক মহাকাব্যিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছেন। যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেখানে পাঠকের সুবিধার্থে বাড়তি টীকা বা ফুটনোট যোগ করা হয়েছে, যাতে প্রেক্ষাপট বুঝতে সুবিধা হয়।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, আজ যখন মুসলিম বিশ্ব হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, তখন পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী? এর উত্তর হলো—ইতিহাস কেবল অতীতের গল্প শোনানোর জন্য নয়, ইতিহাস হলো ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বারবার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যাতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি।

'লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি' আমাদের শেখায় যে, মুসলমানরা যখনই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করেছে এবং ঐক্যের রজ্জু শক্ত করে ধরেছে, তখনই তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আর যখনই তারা ভোগবিলাসে মত্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছে, তখনই নেমে এসেছে বিপর্যয়। মোঙ্গল হামলার সময় মুসলিম বিশ্বের যে অবস্থা ছিল, আজকের পরিস্থিতির সাথে তার কি অদ্ভুত মিল নেই? সেদিনের সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে যদি উম্মাহ আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তবে আজকের এই ঘোর অমানিশা কেটে নতুন ভোর আসবে না—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

ইসলামি সভ্যতা কেবল তলোয়ারের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এর পেছনে ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা এবং মানবতা। হাসপাতালের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—আধুনিক

বিশ্বের এই স্তম্ভগুলোর অনেক কিছুই যে মুসলিম সভ্যতার দান, তা এই বই পাঠ করলে নতুন করে উপলব্ধি করা যাবে।

এই দীর্ঘ অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন করা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। মহান রবের অশেষ মেহেরবানি ছাড়া এটি আলোর মুখ দেখত না। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় প্রকাশনা সংস্থার প্রতি, যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। আমার পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহ আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, বিশেষ করে যখন অনুবাদের ক্লান্তিতে কলম থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হতো।

পরিশেষে, পাঠকবৃন্দের কাছে একটি বিনীত নিবেদন। এই বইটি পাঠ করার সময় আপনারা কেবল তথ্যের দিকে নজর দেবেন না, বরং ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা শিক্ষাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। আমরা যদি আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের বর্তমানকে শুধরে নিতে পারি, তবেই এই শ্রম সার্থক হবে।

মানুষ হিসেবে ভুলের ঊর্ধ্বে নই। অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুলত্রুটি বা অসংগতি চোখে পড়লে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং সংশোধনের জন্য জানানোর অনুরোধ রইল। মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন।

আসুন, বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে আমরা আবারও নিজেদের চিনে নিই। লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি—আমাদের সেই চেনার পথেই এক বিশ্বস্ত গাইডবুক।

শাহেদ হাসান
রাজশাহী
০২/১২/২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ইসলামপূর্ব আরব ১৫

ভৌগোলিক অবস্থান

আরব জাতি

আরবের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নবিজির জীবন ২৪

শৈশবকাল

প্রথম ওহি নাজিল

প্রকাশ্য সংঘাতের সূচনা

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

এক সুস্পষ্ট বিজয়

নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

তৃতীয় অধ্যায় : খুলাফায়ে রাশিদিন ৫২

আবু বকর রা.

উমর রা.

উসমান রা.

আলি রা.

চতুর্থ অধ্যায় : মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৭৬

মুয়াবিয়া রা. ও উম্মাহর ঐক্য

উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘাত

আরও বিজয়াভিযান

আব্বাসীয় বিপ্লব ও উমাইয়াদের পতন
আব্বাসীয় খিলাফত
পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক স্বর্ণযুগ **৯৫**
বায়তুল হিকমাহ
গণিত
জ্যোতির্বিদ্যা
ভূগোল
চিকিৎসাশাস্ত্র
পদার্থবিজ্ঞান
ফিকহ ও হাদিস
ইলমুল কালাম ও আকিদা
ষষ্ঠ অধ্যায় : উত্থান-পতন **১২৩**
ইসমাইলি ধারা
ফাতিমি খিলাফতের অভ্যুদয়
ক্রুসেড
জেরুজালেমের মুক্তি
মোঙ্গলীয় প্লাবন
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন
সপ্তম অধ্যায় : আন্দালুস **১৫৪**
স্পেনে ইসলামের প্রতিষ্ঠা
উমাইয়া শাসনের সূচনা
তায়িফা যুগ ও বারবার সংস্কারকদের আগমন
গ্রানাডা
মোরিস্কো সম্প্রদায়
অষ্টম অধ্যায় : কিনারা **১৮৩**
পশ্চিম আফ্রিকা
মালির উত্থান ও মানসা মুসা
পূর্ব আফ্রিকা

আফ্রিকান দাসপ্রথা ও আমেরিকা
চীনে ইসলাম
ভারত
পূর্ব দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত
নবম অধ্যায় : পুনর্জন্ম ২০৬
একটি সালতানাতের উন্মেষ
ইমান ও তরবারির ছায়ায়
উসমানি সালতানাতের প্রাথমিক গৌরব ও বিপর্যয়
সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ও কনস্টান্টিনোপল বিজয়
উসমানীয় সালতানাতের স্বর্ণযুগ
সাফাভিদের উত্থান
মুঘল সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেব আলমগির
তিন 'গানপাউডার' সাম্রাজ্য
দশম অধ্যায় : উসমানি সালতানাতের পতন ২৩৫
উদারপন্থী সংস্কারের সূচনা
সর্ব-ইসলামবাদ (Pan-Islamism)
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ রাজের উত্থান
আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
মুসলিম বিশ্বের পতন ও পুনর্জাগরণের প্রশ্ন
একাদশ অধ্যায় : পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারা ২৬২
পাশ্চাত্য ধারা
সংস্কারবাদী পুনর্জাগরণ
বিভাজনের সূচনা
জাতি-রাষ্ট্রের উন্মেষ
ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা
গ্রন্থপঞ্জি ২৮৬
লেখক পরিচিতি ২৮৮

প্রথম অধ্যায়

ইসলামপূর্ব আরব

আরব উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হিজাজের রুক্ষ ও পার্বত্য ভূমি প্রাণের বিকাশের জন্য আদৌ অনুকূল নয়। মাত্র দুটি শব্দেই এ মাটির পরিচয় দেওয়া যায়—শুষ্ক ও তপ্ত। গ্রীষ্মের দাবদাহে এখানকার তাপমাত্রা অনায়াসেই শত ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। আসমান থেকে বারিধারা বর্ষণের দৃশ্য এখানে দুর্লভ। আরও পূর্বে তাকালে চোখে পড়ে দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশি; যে প্রান্তরে সবুজের লেশমাত্র নেই, নেই কোনো স্থায়ী জনবসতির চিহ্ন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তম শতকের প্রারম্ভে সেই নিষ্প্রাণ মরুভূমির বুকে ঘটেছিল এক অনন্য জাগরণ; এমন এক শক্তি, যা শুধু আরব নয়, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের ধারা চিরতরে পাল্টে দিয়েছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান

বিশাল আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, যার বিস্তৃতি ২০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও অধিক। ভৌগোলিকভাবে এটি প্রাচীন পৃথিবীর তিন মহাদেশ—এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলনস্থলে অবস্থিত। এটি এক অসামান্য সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করত।

কিন্তু এমন ভৌগোলিক অবস্থান সত্ত্বেও বহিরাগত শক্তিগুলোর দৃষ্টিতে এ ভূমি বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা আরবের তপ্ত মরুপ্রান্তরে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে না গিয়ে বরং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য

বেছে নিয়েছিল 'উর্বর অর্ধচন্দ্রভূমি' (Fertile Crescent)[১] এবং নুবিয়ার শ্যামল ভূমিকে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পারস্য ও ভারত অভিযানের পথে মহাবীর আলেকজান্ডার এই ভূখণ্ড এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যও খ্রিস্টপূর্ব ২০ অব্দে ইয়েমেনের পথ ধরে এই উপদ্বীপ আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখানকার কঠোর ভূপ্রকৃতি ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারেনি। ফলে অঞ্চলটিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করার সেই অভিযান ব্যর্থ হয়।

আরব উপদ্বীপ যে বহির্বিশ্বের কাছে বহু কাল ধরে প্রায় উপেক্ষিত ছিল, তার কিছু সংগত কারণও ছিল। এই উপেক্ষার মূল কারণ এর রুক্ষ প্রকৃতি। এখানকার জলবায়ু এতটাই প্রতিকূল যে, খোদ যাযাবর অধিবাসীদের জন্যও এখানে টিকে থাকা ছিল এক কঠিন সংগ্রাম।

দক্ষিণ উপকূলে শরৎকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কিছুটা বৃষ্টি হয়। কিন্তু সুউচ্চ পর্বতমালা মেঘের পথ আগলে রাখায় তা মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে আরবের তপ্ত প্রান্তর বৃষ্টিহীনই থেকে যায়। অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগরের দিক থেকে ভেসে আসা মেঘমালাও উত্তরের সীমান্তে এসে মিলিয়ে যায়। ফলে সমগ্র উপদ্বীপজুড়ে বছরব্যাপী শুষ্কতা বিরাজ করে।

সারা ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে আছে 'ওয়াদি' নামক শুষ্ক নদীখাত। কিন্তু সেগুলোকে নদী হিসেবে চেনা প্রায় দুঃসাধ্য। যখন আকাশে মেঘ জমে এবং বারিধারা বর্ষিত হয়, তখন এই ওয়াদিগুলোই খরস্রোতা ও শক্তিশালী জলধারায় রূপ নেয়। এই শুষ্ক ভূমিতে যে সামান্য কিছু মৌসুমি তরুলতা জন্মায়, তাদের বিকাশের জন্য এই জলপ্রবাহ অপরিহার্য। তবে বর্ষার মৌসুম শেষ হলে ওয়াদিগুলো তাদের চিরচেনা শুষ্ক রূপে ফিরে আসে এবং পানির

[১] 'উর্বর অর্ধচন্দ্রভূমি' (Fertile Crescent) মধ্যপ্রাচ্যের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল, যা মানচিত্রে দেখতে অনেকটা কাস্তে বা অর্ধচন্দ্রের মতো। এই অঞ্চলটি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূল (লেভান্ত) থেকে শুরু হয়ে পূর্বে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (ফুরাত) নদীর অববাহিকা (মেসোপটেমিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত। চারপাশের শুষ্ক মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের বিপরীতে, এই নদীবিধৌত এলাকাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর। এই উর্বরতার কারণেই এখানে বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। একে কখনো কখনো 'সভ্যতার সূতিকাগার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মিশরীয়রা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সম্পদহীন মরুভূমির চেয়ে এই উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকেই বেশি গুরুত্ব দিত। — অনুবাদক

উৎস হিসেবে তখন তা সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে মরূদ্যানগুলো বেশি কার্যকর ছিল। মরুদ্যান হল বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে জেগে থাকা এক-একটি ক্ষুদ্র উর্বর ভূখণ্ড। এই মরূদ্যানগুলো ছোট ছোট জনপদকে আশ্রয় দিতে কিংবা পথিকদের মনজিল হিসেবে কাজ করতে সক্ষম ছিল বটে, কিন্তু একটি বৃহৎ ও উন্নত সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য তা কোনোভাবেই যথেষ্ট ছিল না।

আরব জাতি

যেকোনো সভ্যতার গঠন ও বিকাশ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। আরব সভ্যতাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তারা যে কঠোর পরিবেশে বাস করত তাদের জীবনযাত্রাও ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠেছিল। মরুভূমির বুকে স্থায়ী জনপদ গড়া সম্ভব ছিল না বলেই আরবরা তাদের পশুপালের জন্য চারণভূমির সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অবিরাম ঘুরে বেড়াত। এমনকি আরব শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও একটি মত প্রচলিত আছে। বলা হয় যাযাবর বা ঘুরে বেড়ানো বোঝায় এমন কোনো শব্দ থেকেই এর জন্ম।

গ্রীষ্মের মাসগুলো তারা কোনো মরূদ্যান বা কূপকে কেন্দ্র করে পার করে দিত। এই সময় খুব সামান্য খাবার ও পানি দিয়েই তাদের দিন কাটাতে হতো। মাসের পর মাস প্রখর গ্রীষ্মের এই কষ্ট সহ্য করার পর আসত শরৎকাল। তখন দক্ষিণাঞ্চলে বা ইয়েমেনের দিকে বৃষ্টি নামত আর পশুপালের জন্য তৃণভূমির দেখা মিলত। তখন তারা সেই অঞ্চলের দিকে রওনা হতো। বৃষ্টির পানিতে সজীব সেই চারণভূমিতে তাদের ভেড়া, ছাগল ও উটের পাল শীতের মাসগুলোতে বেঁচে থাকার মতো পর্যাপ্ত খাবার পেত। সেখানেই তারা তাঁবু গেড়ে সাময়িক আস্তানা বাঁধত।

বসন্তের আগমনে যখন বৃষ্টি থেমে যেত আর শুষ্ক মৌসুম শুরু হতো তখন আরবরা আবার তাদের সেই পুরোনো মরূদ্যান ও কূপের আশ্রয়ে ফিরে আসত। উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি গ্রীষ্মকাল পার করা। সেই আদিকাল থেকে যাযাবর আরবদের জীবনে এই কঠোর চক্রই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। আরবের মরুভূমিতে আজও যে বেদুইনরা বাস করে তাদের জীবনেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

> ইসলামপূর্ব আরবে আতিথেয়তার এত গুরুত্ব ছিল যে, কোনো আরব গৃহে আগত মেহমানকে তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করার আগেই অন্তত তিন দিনের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান করা হতো।
>
> পরবর্তীতে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উত্তম প্রথাকে আরও সুদৃঢ় ও মহিমান্বিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, 'তিন দিন পর্যন্ত আতিথেয়তা লাভ করা মেহমানের হক।'

মরুপ্রান্তর একাকী চলার জায়গা নয়। আরবদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পথে অনেক বিপদ ছিল বলে একে অপরের সহযোগিতা ছিল খুব জরুরি। দুর্ভিক্ষ ও প্রচণ্ড গরমের মতো প্রাণঘাতী বিপদ থেকে বাঁচতে স্বজনরাই ছিল তাদের মূল ভরসা। পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে সম্পদ এবং বাসস্থান ভাগ করে নিত। তাই সেখানে একা বা নিজের মতো করে চলার চিন্তা তখন কঠোরভাবে নিন্দনীয় ছিল।

ফলে আরব সমাজে পরিবার এবং গোত্র ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক। কয়েকটি পরিবার একসাথে ভ্রমণ করত এবং তাদের একটি কাবিলা বা খান্দান হিসেবে গণ্য করা হতো। আবার কয়েকটি কাবিলা মিলে গঠিত হতো একটি গোত্র। এই গোত্রের নেতৃত্ব দিতেন শায়খ উপাধি পাওয়া একজন গোত্রপতি।

ইসলামপূর্ব পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য গোত্রীয় পরিচয় এবং গোত্রের প্রতি আনুগত্য ছিল খুব জরুরি। কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানেই ছিল নিরাপত্তা, সমর্থন ও অর্থনৈতিক সহায়তা পাওয়া। নিজেদের সদস্যদের বাঁচাতে গোত্রগুলো যুদ্ধে জড়াতেও দ্বিধা করত না। ইসলামের আগে গোত্রীয় সংঘাত ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। চারণভূমি ও পশুপালের দখল নিয়ে প্রায়ই এমন ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ লাগত যা চলত বছরের পর বছর। এতে দুই পক্ষেরই অনেক মানুষ মারা যেত। আসলে আরবদের জন্য সংগ্রাম ছিল এক কঠোর

বাস্তবতা। কখনো এই লড়াই ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে আবার কখনো তা ছিল স্বজাতির বিরুদ্ধে।

এমন গোত্রভিত্তিক যাযাবর সমাজে শিল্পচর্চা করা ছিল বেশ কঠিন কাজ। প্রাচীন মিশর ও গ্রিসের মতো বিশাল ভাস্কর্য বা চিত্রকর্ম তৈরির জন্য যে বিপুল সম্পদ ও দীর্ঘ সময়ের দরকার হয় আরবে তা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মরুভূমির তপ্ত বালুতে মানুষের মনের সৌন্দর্যপিপাসা হারিয়ে যায়নি। বরং তা ভাষা বা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নতুন রূপে প্রকাশ পেল।

আরবি ভাষার বিশেষত্ব হলো এটি কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয় বরং নিজেই শিল্প প্রকাশের এক আলাদা জগত। এর শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠন এতটাই নমনীয় যে একই অর্থ নানাভাবে প্রকাশ করা যায়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই কবিতা হয়ে উঠল আরবের প্রধান শিল্পমাধ্যম। গোত্রের গৌরব ও যুদ্ধের বীরত্বগাথা নিয়ে লেখা দীর্ঘ মহাকাব্যগুলোই ছিল তাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। সেরা কবিরা সমাজে খুব সম্মান পেতেন। তাদের কবিতা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ত।

ইসলামপূর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতাকে বলা হতো মুআল্লাকাত যার অর্থ ঝুলন্ত কবিতামালা। এই নামকরণের কারণ হিসেবে বলা হয় যে কবিতাগুলো মক্কার কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। আবার অন্য একটি মত হলো কাব্যকলার প্রতি আরবদের গভীর শ্রদ্ধার কারণে তা মানুষের হৃদয়ে গেঁথে থাকত বলেই এমন নাম হয়েছে।

এমন উন্নত সাহিত্যিক সমাজ হওয়া সত্ত্বেও আরব উপদ্বীপে লিখনরীতির প্রচলন ছিল বিরল। যদিও পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ ভাষার একটি লিখিত রূপের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তা শেখার আগ্রহ ছিল সামান্যই। আরবদের জন্য স্মৃতিতে ধারণ করাই যথেষ্ট ছিল। তারা হাজার হাজার পঙক্তির দীর্ঘ কবিতাও অনায়াসে মুখস্থ করে ফেলত, যেন তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। ইসলাম এই উপদ্বীপে আগমনের পর এই স্মৃতিশক্তিই এক অপরিহার্য যোগ্যতা হিসেবে প্রমাণিত হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলামপূর্ব আরবরা মুশরিক ছিল। বহু রবের উপাসনা করত। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুদূর অতীতে

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম মক্কা উপত্যকায় এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের জন্য কাবাঘর নির্মাণ করেন। মানবজাতির আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম-এর স্থাপিত ভিত্তির উপর এই ঘরটি নির্মিত হয়েছিল।

কাবা অনাড়ম্বর, আয়তাকার এক স্থাপনা। এই পবিত্র গৃহ থেকেই ইসমাইল আলাইহিস সালাম আরবদের মাঝে একত্ববাদের বাণী প্রচার করতে সক্ষম হন এবং আরবরাও তাঁকে নিজেদের একজন হিসেবে বরণ করে নেয়।

কিন্তু কালের পরিক্রমায় ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরেরা তাঁর প্রচারিত একত্ববাদের শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলে। প্রথমে আল্লাহর বিভিন্ন গুণ প্রকাশের প্রতীক হিসেবে পাথর ও কাঠের মূর্তি নির্মিত হতে লাগল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মূর্তিগুলোই স্বতন্ত্র উপাস্য বা দেব-দেবীর রূপ গ্রহণ করে। একপর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে কাবার ভেতরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল।

তথাপি আরবদের মন থেকে ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরবদের মানসপটে তাঁরা তখনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবেই সমাসীন ছিলেন এবং তাঁদের কিছু মৌলিক শিক্ষাও সমাজে মর্যাদা পেত। তারা নিঃসন্দেহে ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের উপাস্যকে বিশ্বাস করত, যাঁকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকা হতো। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল, তিনি বহু উপাস্যের মধ্যে একজন মাত্র এবং এই মূর্তিগুলোই হলো অন্য উপাস্যদের প্রতিনিধি। এই বিশ্বাস বা আকিদা ঐ দুই মহান নবির প্রচারিত একত্ববাদ থেকে ছিল যোজন যোজন দূরে। এর মধ্যে উত্তরের সুমেরীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছিল।

আরব উপদ্বীপে বিচ্ছিন্ন ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। তারাও নবিগণকে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু মুশরিক আরবদের সাথে তাদের সাদৃশ্য বলতে ছিল এটুকুই। আরবের এই স্বল্পসংখ্যক একত্ববাদীরা মূর্তিপূজক আরবদের সাথে পুরোপুরি মিশে যাওয়া থেকে বিরত থাকত এবং নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ সমাজেই বসবাস করত।